Vol. 51 | No. 2 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবদুল হকের সাহিত্যভাবনা : একটি পর্যালোচনা

Volume	51
Issue	2
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রবিউল হোসেন
Published online	February 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i2.8
Pages	১৩১-১৪৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুল হকের সাহিত্যভাবনা : একটি পর্যালোচনা

Check for updates

রবিউল হোসেন*

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক পুরুষ ও মননশীল লেখক হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। যে সকল প্রগতিপন্থী লেখক-সমালোচক বাঙালিমানসকে আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াসে লেখনী ধারণ করেন আবদুল হক তাঁদের অন্যতম। তিনি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দোসরদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে একের পর এক লেখা প্রকাশ করেন। যেগুলো কখনো স্বনামে কখনো বেনামে প্রকাশিত হয়। এসব রচনা শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি লেখেন মৌলিক রচনাসমূহ — কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক। সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে অনুবাদ করেন বেশ কিছু বিদেশি নাটক।

আবদুল হকের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধসমূহের মূল সুর — বাংলা সাহিত্যকে একটি উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়া; বাঙালি জাতিকে সাংস্কৃতিক মুক্তির আস্বাদ দেওয়া। অবশ্য সাহিত্যের মূল্যায়নধর্মী অনেক রচনাও তাঁর রয়েছে। তবে তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব হলো— জাতীয়তাবাদভিত্তিক রচনাসমূহ। এগুলোর কারণে *মাসিক সমকাল* (১৯৫৭) ও এর সম্পাদক সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) একাধিকবার বিপদ বরণ করেন। *সমকাল*-এর ১৩ বছরের (১৯৫৭-১৯৭১) জীবনকালে অন্তত ৪টি সংখ্যা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। একটি আবুল ফজলের, দুটি আবদুল হকের এবং একটি হাসান হাফিজুর রহমানের লেখার জন্য।

সাহিত্য ক্ষেত্রে আবদুল হকের আগমন 'কে ও' (১৯৩৮) নামক কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। (মাহবুব, ২০০৮ : ৩১) *ছিন্ন পত্রিকার কাহিনী* ও *রোকেয়ার নিজ বাড়ী* নামক তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৭ ও ১৯৮১ সালে। একাধিক উপন্যাস লেখার নমুনা পাওয়া গেলেও *কালো মুখোশ* নামক একটি রচনা প্রকাশিত অবস্থায় পাওয়া যায়। নাট্যকার হিসেবেও তাঁর বেশ পরিচিতি ছিল। আবদুল হকের প্রথম প্রকাশিত নাটক *অদ্বিতীয়া* (১৯৫৬)। এরপর *ফেরদৌসি* (১৯৬৪) ও *সোনার ডিম* (১৯৭৬) প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শাখা নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে তিনি অনুবাদ করেন হেনরিক ইবসেন ও রবার্ট শেরউড।

আবদুল হকের সামগ্রিক সাহিত্যিক জীবনের পরিচয় দিতে গেলে সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তা। (মাহবুব, ২০০৮ : ৩১) *ক্রান্তিকাল* (১৯৬২), *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* (১৯৬৮), *বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৩), *সাহিত্য ও স্বাধীনতা* (১৯৭৪), *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব* (১৯৭৬), *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৯৩)

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

এবং *চেতনার এলবাম ও বিবিধ প্রসঙ্গ* (১৯৯৩) শিরোনামে তাঁর ৭টি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও নূরুল হুদার সম্পাদনায় *আবদুল হক– লেখকের রোচনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ ১৯৫৩-'৯৩* (১৯৯৬) এবং সৈয়দ আজিজুল হকের সম্পাদনায় *আবদুল হক : স্মৃতি-সঞ্চয় ১* (২০০৩) ও *আবদুল হক : স্মৃতি-সঞ্চয় ২* (২০০৫) নামে তিনটি ডায়েরি ও আত্মজীবনীমূলক রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি সম্পাদনা করেন *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড ১৯৮৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৬) এবং *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড ১৯৮৮, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯০)।

আবদুল হকের প্রবন্ধসমূহকে দুটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়। এক. জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক প্রবন্ধ এবং দুই. সাহিত্যবিষয়ক রচনা। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধসমূহের আবার দুটি পর্যায়। এক. সাহিত্যের মতাদর্শবিষয়ক রচনা এবং দুই. সাহিত্য-সাহিত্যিক মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধ। বর্তমান আলোচনায় আমরা তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশিত সাহিত্যভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব। বিষয় বিবেচনায় এখানে কেবল মতাদর্শমূলক রচনাসমূহ ব্যবহার করা হবে। তবে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় অন্যান্য রচনারও উল্লেখ থাকবে। আবদুল হকের সাহিত্যভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণের শুরুতে সমকালীন সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করছি।

এক

উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে বাঙালি মুসলমান সমাজে জাগরণ প্রচেষ্টা শুরু হলে তাদের নিজেদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, দেশ-জাতি ইত্যাদি নিয়ে দ্বিধা-সংশয় দেখা দেয়। তাদের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে নিজেদের জাতিগত পরিচয় কোনটি — 'ভারতীয়, বাঙালি না মুসলমান'। এ বিতর্কের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয় ভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। এসব বিষয় নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক-বিতর্ক ক্রমশ কমে এলেও ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করে কলকাতার 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (১৯৪২) ও ঢাকার 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' (১৯৪২)-এর সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক মতাদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়ে।

'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' সাহিত্যে পাকিস্তানবাদী ভাবধারা রূপায়ণের জন্যে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুখ্য নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করে এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের থেকে পৃথক, মুসলমানদের জীবনভিত্তিক, আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দবহুল বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা ও নতুন বাংলা ভাষা নির্মাণে সচেষ্ট হয়। (আবুল, ১৯৮৫ : ১৮৫-১৮৬) আর 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্য, পুথি সাহিত্য ও পূর্ব-পাকিস্তানের অস্বীকৃত গ্রামজীবনকে সাহিত্যে আরো বেশি করে বিষয়ীভূত করার নীতি গ্রহণ করে। (সাঈদ, ১৯৮৩ক : ১৩) সাহিত্য সংসদ মনে করে, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য তাঁর ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পুঁথি সাহিত্যের অনুকরণে গড়ে উঠবে। (মোরশেদ, ২০০৭ : ৬১৩) কেননা, প্রচলিত বাংলা সাহিত্য হিন্দু-সংস্কৃতিজাত, যা আমাদের ধর্ম-দর্শনের বিরোধী। (মুস্তাফা, ২০০৫ : ৩৮৭) মূলত এরূপ একটি অস্পষ্ট ও

আবেগপূর্ণ ধারণা থেকেই মুসলিম সাহিত্যের পক্ষে প্রচারণা শুরু হয় এবং হিন্দু রচিত সাহিত্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে বাঙালি মুসলিম লেখকদের প্রতি আহবান জানানো হয়। (হাবিব, ২০০৩ : ৫৫) দুটি সংগঠনই পাকিস্তান আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল।

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হলে পূর্ব-বাংলা পাকিস্তানের প্রদেশে রূপান্তরিত হয়। সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর বাংলা ভাগ হবার কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বরূপ এবং ভিত্তি কীরূপ হবে তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দেখা দেয়। (সাঈদ, ১৯৮৩খ : ৩) দেশভাগের পর মুসলিম লিগ সরকার এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা না দিলেও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রেনেসাঁ সোসাইটি ও সাহিত্য সংসদের প্রদর্শিত নীতি গ্রহণ করে। (সাঈদ, ১৯৮৩ক : ১৪) আবার আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ স্বঘোষিত পাকিস্তানবাদী তাত্ত্বিকেরাও প্রচলিত সাহিত্যাদর্শ থেকে পৃথক অর্থাৎ স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে নানামুখী আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করেন। (আনিসুজ্জামান, ১৯৯১ : ৬৮-৬৯)

মূলত ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক কিছু কারণের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের প্রবল সাম্প্রদায়িক চেতনা যুক্ত হয়ে স্বদেশ ও ভাষা সম্পর্কে তাদের মানসে যে-সাংস্কৃতিক সংকটের জন্ম হয়েছিল তা লক্ষ করা যায় সাহিত্যের আদর্শ, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের মতামতের বিভিন্নতার মধ্যে। আরও অনেক সত্যের মতো যখন থেকে তারা এ সত্যও উপলব্ধি করেছিলেন, তাদের সমাজকে অধঃপতন থেকে বাঁচাতে হলে মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যচর্চার কোনো বিকল্প নেই, তখন থেকেই তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল কোন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি মুসলমানদের জন্যে মঙ্গলদায়ক হবে তা নিয়ে। মুসলিম লেখকদের প্রধানতম অংশ মনে করতেন, মুসলমানদের উন্নতির জন্যে তাদের 'জাতীয় সাহিত্য' সৃষ্টি করা দরকার। এই সাহিত্যকেই কেউ কেউ ইসলামি বা মুসলিম সাহিত্য বলতেন। কিন্তু ইসলামি বা মুসলিম সাহিত্য বস্তুটি আসলে কী — তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ ছিল। তাই অনেকেই এই সাহিত্যের স্বরূপ চিহ্নিত করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। (হাবিব, ২০০৯ : ১৬০-১৬১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই স্বতন্ত্র সাহিত্য সম্পর্কিত মতাদর্শের সমর্থকগোষ্ঠী 'স্বাতন্ত্র্যবাদী' হিসেবে চিহ্নিত হন। আর একপক্ষ ছিলেন সমন্বয়বাদী। সমন্বয়বাদী লেখক-সমালোচকগণ বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে সমর্থন করে সাহিত্যের সাম্প্রদায়িক নামকরণ ও প্রচারের বিরোধিতা করেন। তাঁরা ধর্ম ও সাহিত্যকে আলাদা আলাদাভাবে বিচারের পক্ষে অবস্থান নেন। এঁরা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে লেখকদের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে বৈচিত্র্য সন্ধান করেন।

অন্যপক্ষে ছিলেন প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীরা। এঁরা সামাজিক পশ্চাদমুখীনতা ও রাজনীতিক পরাধীনতার মতো সমাজের মূল সমস্যাকে বিষয়বস্তু করে সাহিত্যকে প্রগতিশীল খাতে এগিয়ে নেবার কথা বলেছিলেন। (সাঈদ, ১৯৮৩ক : ১১) এক্ষেত্রে

'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ' (১৯৪৭), 'সংস্কৃতি সংসদ' (১৯৫১), 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' (১৯৫২) প্রভৃতি সংগঠন মানবতাবাদী ধারার সাহিত্য সৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণে দৃঢ় ভূমিকা রাখে। এখানে স্মরণীয় যে, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ শুরু থেকে পাকিস্তানবাদী কর্মসূচি ও আদর্শ নিয়েও কাজ করেছে। প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনে'র (১৯৫১) মূল প্রস্তাবনায় বলা হয় — 'মানুষের কল্যাণের জন্য যে-সাহিত্য, সমাজের গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে-সাহিত্য, আমরা সে সাহিত্যের প্রতি আস্থাশীল।' (সাঈদ, ১৯৮৩ক : ১৪) এঁরা বাঙালির সাহিত্যিক ঐতিহ্য হিসেবে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আবদুল হক ছিলেন এই ধারার অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক পুরুষ। তাঁর চেতনাজগত গড়ে উঠেছিল ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর (১৯২৬) চিন্তা-উৎস থেকে। (আহমাদ, ২০০১ : ৯৫)

স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখকদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তা-চেতনার জন্ম বিভাগপূর্বকালে হলেও বিভাগোত্তর পূর্ব-পাকিস্তানের লেখক-সমাজের এক অংশ এ থেকে বের হতে পারেন নি। (মোরশেদ, ২০০৭ : ৫৬৫) ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে সাহিত্যের আদর্শ বিষয়ক নানা মতাদর্শের সৃষ্টি হয়। আবদুল হক এঁদের উদ্দেশ্যকে অযৌক্তিক ও অবাস্তব বিবেচনা করে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা শুরু করেন এবং জাতীয়তার প্রশ্নে প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মধ্যযুগীয় মানসিকতা মুক্ত করে আধুনিক ও ভবিষ্যৎমুখী করে তোলেন। আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশে তাঁর কাঙ্ক্ষিত রূপ গ্রহণ করবে।

দুই

পূর্বেই বলা হয়েছে, দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত আবদুল হক-এর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ থেকে বর্তমান আলোচনায় মতাদর্শ সম্পর্কিত রচনাসমূহে প্রতিফলিত চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করা হবে। উল্লেখ্য, সাহিত্য-সাহিত্যিক মূল্যায়ন অংশটি স্বতন্ত্রভাবে বিচারের দাবি রাখে।

আবদুল হক বাঙালি মুসলমানের জাগরণকেই মননশীল সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। (আহমাদ, ২০০১ : ৯৫) তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত ইতিহাসচেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও কালজ্ঞান বাঙালির চেতনাকে শাণিত করেছে। (হক, ২০০৩ : ৫) সাহিত্যের মতাদর্শবিষয়ক প্রবন্ধসমূহের বিষয়বস্তু বিচিত্র। সাহিত্যের স্বরূপ, জাতিক বিকাশে সাহিত্যের ভূমিকা, সাহিত্যের ঐতিহ্য, পাকিস্তান সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, সাহিত্যের অনগ্রসরতার কারণ, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহিত্যিকের স্বাধীনতা, লেখকদের দুর্দশার কারণ, বাঙালির ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিবোধের সংকীর্ণতা, লেখকদের স্বীকৃতি, পাঠকের রুচি, সমালোচকের বৈশিষ্ট্য, সাহিত্য সমালোচনায় সাম্প্রদায়িকতার কুফল, কবিতার পূর্বাপর, সাহিত্যের অন্যতম শাখা নাটকের দুরবস্থার কারণ ও করণীয়, অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হয়েছে। লেখক সময়ের সন্তান হওয়ায় এবং রচনাসমূহের প্রকাশের কাল

রাজনীতিকভাবে ধূম্রজালে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁর রচনাসমূহে উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। এ পর্যায়ে আমরা প্রবন্ধের শিরোনামের আলোকে আবদুল হকের সাহিত্যভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব। এর অংশ হিসেবে প্রথমে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এবং আমাদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে আবদুল হকের মতামত পর্যালোচনা করা হলো।

তিন

ঐতিহ্যের (Tradition) অর্থ — পরম্পরাগত কথা, পুরুষানুক্রমিক ধারা, কিংবদন্তি, লোকপ্রসিদ্ধি প্রভৃতি। যে স্টাইল, প্রথা, রীতি, বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গি অতীত থেকে বর্তমানে কার্যত অব্যাহত পরম্পরার মতো চলে আসে তাকে 'ঐতিহ্য' বলে। (সুরভি, ১৯৯৯ : ৩২) ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত এবং অতীতের গর্ভে এর মূল নিহিত। ঐতিহ্যের চেতনা অংশত অবচেতন। এ চেতনার বিলুপ্তি ঘটলে ঐতিহ্য সজীব ও সতেজ আছে কিনা এ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। সাহিত্যের বিচারে ঐতিহ্যের যে অর্থ তা ধর্মীয় বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। ধর্ম আমাদের মজ্জাগত এবং এর চিন্তাধারা অনড় এবং অপরিবর্তিত। কিন্তু সমাজ এবং সাহিত্য তা নয়। সাহিত্য কোনো জাতির চিন্তা ও অনুভবকে প্রকাশ করে। যে জাতির সাহিত্য আছে তার উপর কালের নিষ্ঠুর পদক্ষেপ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। (হক, ১৯৭৪ : ২৫)

সাহিত্য চর্চার প্রথম পাঠ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়, যা আয়ত্ত করতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। (ফজল, ১৩৬৮ : ২৬৭) আবদুল হকের 'প্রত্যয়ের সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের আদর্শগত সংকট নিরসনে লেখকসমাজকে আত্মপ্রত্যয়ী হবার আহ্বান জানিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সাহিত্যের অগ্রগতি, করণীয় এবং সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা আছে।

প্রাবন্ধিকের মতে, ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশে তার কাঙ্ক্ষিত রূপ পাবে। এজন্যে বর্তমানে সাহিত্যকে আর জাতীয় পরিমণ্ডলে আবদ্ধ করে বিচার করা হয় না। সাহিত্য এখন আন্তর্জাতিক। বাংলা সাহিত্যের বেলায় এটি সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবের কারণে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানি সাহিত্য সৃষ্টির উন্মাদনায় রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা চলছে সে-সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের সতর্ক অভিমত —

> চিন্তা ও প্রকরণ উভয়ের ব্যাপারে পশ্চিমী এবং বলতে গেলে বিদেশী, সাহিত্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ বাংলা সাহিত্যে নতুন কিছু নয়; কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্য বলতে যে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত অথবা মুক্তি-প্রয়াসী বাংলা কাব্য বোঝায়, এবং বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কাব্যের যে অংশটিকে বোঝায়, তার মধ্যে ঐ অনুসরণের ব্যাপারে কিছু চিন্তাহীন নির্বিচার প্রয়াস আছে কি-না তা সাহিত্যের স্বাস্থ্যের জন্য মাঝে মাঝে ভেবে দেখা দরকার। (হক, ১৯৭৬ : ৩)

আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিস্থিতি ইউরোপের অনুরূপ নয়। অথচ, সাহিত্য-সমাজ ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। আবদুল হক মনে করেন, ইউরোপ যে সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল তা এখন ক্ষয়িষ্ণু। ঐসব দেশের সমকালীন সাহিত্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যে কারণে ওরা এখন মনস্থির করতে পারছে না ওদের ভবিষ্যৎ সাহিত্য সম্পর্কে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিও বিশেষ ধারায় বিকশিত হবার পর এখন ক্ষীয়মাণ। কিন্তু আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি অতটা ক্ষয়িষ্ণু নয়। একই সঙ্গে রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যার ফলে আমাদের সম্ভাবনা অফুরন্ত। অবশ্য এর জন্যে প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা, জাতীয়তাবোধে জাগ্রত হওয়া, সংহতি ও সংগঠন গড়ে তোলা। যা বিগত শতকগুলোতে আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু এখন এরূপ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের কর্তব্য হবে —

> আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি তাকে আরও সার্থক করা, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অর্থে; আমাদের অস্তিত্বকে আরও অর্থময় করা, আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া; আমাদের যে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে তাকে তীক্ষ্ণ, প্রোজ্জ্বল, প্রবল, সুপ্রতিষ্ঠিত করা। (হক, ১৯৭৬ : ১১)

কিন্তু এ পথের প্রধান বাধা হলো — লেখকদের 'আত্মবিস্মৃতি ও চিন্তাহীনতা'। বিষয়দুটি তাঁরা স্মরণ রাখলে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য আন্তর্জাতিক রূপে প্রকাশিত হবে। লেখক-সমাজের করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন —

> আমাদের ইতিহাসের অন্ততঃ বর্তমান লগ্নে যা দরকার, এবং স্বাভাবিক, তা হচ্ছে প্রত্যয়ের সাহিত্য এবং আত্মপ্রত্যয়ের সাহিত্য। ... আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত প্রকৃত মানবজীবন ধারণ এবং মূল্যবান কিছু করা সম্ভব নয়। লেখক স্বদেশী অথবা বিদেশী রেওয়াজের প্রতিধ্বনি মাত্র নন; তিনি ব্যক্তি, কিন্তু শুধু ব্যক্তিও নন; তিনি তাঁর সমাজের এবং তাঁর কালের কণ্ঠস্বর এবং কখনো কখনো ইতিহাস-নায়ক। সমাজের অন্তর্নিহিত বাসনা রূপ প্রার্থনা করে তাঁরই মধ্য দিয়ে। প্রকৃত সচেতন এবং স্বচ্ছ লেখক এই ভূমিকার মধ্যেই নিজের সার্থকতা সন্ধান করবেন। (হক, ১৯৭৬ : ১২)

বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পরও এক শ্রেণির শিক্ষিত অথচ দেশপ্রেমহীন, জাতীয় মর্যাদাহীন এবং সাংস্কৃতিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষ তাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসঙ্গ এলে অপারগতা জানিয়ে কুলীন হবার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণির মানুষদের ধিক্কার দেবার পাশাপাশি তাদের বাঙালিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন আবদুল হক। একই সঙ্গে এই আত্মবিস্মৃত বাঙালিদের জাগ্রত করার প্রয়াসে 'সাহিত্য ও দেশপ্রেম' শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসারে প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

তাঁর মতে, শিক্ষা ক্ষেত্রের সার্বিক বিশৃঙ্খলা বাঙালির জাতিক বিকাশে সবচেয়ে বড় বাধা। সাংস্কৃতিক যোগসূত্রহীন, রাজনীতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিক্ষাব্যবস্থা উক্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। আর এ সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি। যা কোনো দেশের সার্বিক সংস্কৃতির জন্যে শুভ নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ

সীমাবদ্ধার অবসানই কেবল আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। বাঙালি তাঁর নিজ পরিচয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। এজন্যে আমাদের করণীয় হবে —

> বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে আজকের শিক্ষিত সমাজের মনোবৃত্তির অবসান, শিক্ষিত সমাজের যে শীতল প্রস্তর-কঠিন ঔদাসীন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অপাংক্তেয় করে রেখেছে সেই ঔদাসীন্যের অবসান। এজন্যে কেবল সাহিত্যের নিজস্ব আবেদন থাকাই যথেষ্ট নয়, সর্বব্যাপী দেশপ্রেমেরও প্রয়োজন, যে দেশপ্রেম মানুষকে বিদেশের বিভ্রান্তিকর ঔজ্জ্বল্য থেকে বাঁচিয়ে বারবার দেশের ধূলিময় অন্তরঙ্গতায় ফিরিয়ে আনে। (হক, ১৯৬২ : ২৯)

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে স্বাতন্ত্র্যবাদীদের সাহিত্য রচনায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ অনুপ্রবিষ্ট করার চেষ্টা, সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ যথাসম্ভব বর্জন, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের ভাষা যেমন কলকাতা-কেন্দ্রিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষাকে ঢাকা-কেন্দ্রিক করার প্রচেষ্টা, পুঁথি সাহিত্যের ভাষার পুনঃপ্রবর্তন চেষ্টা, ইসলামি তমদ্দুনই এদেশের সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ ও বিষয়বস্তু হিসেবে প্রচার করা, স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা সাহিত্যকে অস্বীকার করা এবং পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যের আমদানি বন্ধ করা প্রভৃতি প্রচেষ্টার ফলে বিভাগ-উত্তর কালে ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে এদেশে পরস্পরবিরোধী মতামত প্রচারিত হয়। প্রগতিবাদী তাত্ত্বিক আবদুল হক বিষয়টিকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে চিহ্নিত করেন। কেননা—

> অনেক রকমের এমনকি পরস্পর বিরোধী মতামত সবদেশেই থাকে, থাকা উচিত, নইলে সাহিত্যে বৈচিত্র্য আসে না, লেখকেরা নিজেদের প্রতিভা, দৃষ্টিকোণ, আদর্শ অনুযায়ী পথ বেছে নিতে পারেন না, একঘেয়েমির রুদ্ধদ্বার পরিবেশে সাহিত্য পাণ্ডুর নিরক্ত নির্জীব হয়ে ওঠে। (হক, ১৯৭৬ : ৪০)

কিন্তু সমস্যা হয় — যখন এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী এসব মতামত প্রায় ধর্মবিশ্বাসের মতো, অলঙ্ঘনীয় রাষ্ট্রীয় আদর্শের মতো চালাবার চেষ্টা করে। কেননা বিষয়টিকে কোনো একটি দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা চলে। এজন্যে আবদুল হক এর বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তিনি মনে করেন, যদিও মতামতগুলো উদ্ভট, তথাপি ক্রমাগত প্রচার করতে থাকলে তা ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান কম নয়। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি একান্তভাবে তারই জন্যে। তথাপি কিছু সংখ্যক বাঙালি মুসলমান ভাষাকে নিয়ে বিব্রতবোধ করেছেন। তাদের ধারণা, এদেশে মুসলমানরা এসেছে উত্তর ভারত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে। সে কারণে বাংলা ভাষা তারা তেমন শেখেন নি। কাজেই বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

আমরা জানি, এই বিশ শতকের প্রথমার্ধে রব উঠেছিল — 'উর্দুই হওয়া উচিত বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের ভাষা।' প্রস্তাবটি অস্বাভাবিক এবং উদ্ভট হওয়ায় জনরবের পর্যায়েই থেকে যায়। কেননা ততদিনে বাঙালি মুসলমান এগিয়ে গেছে অনেক দূর। ফলে

স্বাধীনতা লাভের পরে অর্থাৎ দেশভাগের পর প্রগতিশীল বাঙালির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল– 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। এমনকি সমগ্র পাকিস্তানেই অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলাকে স্বীকার করা চাই। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দাবির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। কিছু সংখ্যক বাংলাভাষী মানুষও তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। তারা বলে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হোক বা না হোক — 'আরবী হরফে বাংলা লেখা চাই'। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এবং দাবি করে — 'স্বীকার করলাম বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে' এবং এ ভাষা আরবি হরফে নাইবা লেখা হলো, তথাপি নতুন মতাদর্শিক রাষ্ট্রের জন্যে সংস্কৃত শব্দ বর্জন করে যতদূর সম্ভব এ ভাষায় আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ আমদানি করতেই হবে। এমনকি 'বাংলাকে আরেকটি আরবী ভাষায় পরিণত করতে হবে।' উপর্যুক্ত বিষয়াবলির বিরোধিতা করে আবদুল হক অভিমত দেন —

> পাকিস্তান কায়েম হওয়ার দরুণ অঢেল আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ আমদানীর যৌক্তিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই, কিন্তু আমি সাহিত্যিকদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, যে-কোন ভাষার শব্দ এনে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার এবং তার প্রকাশ ক্ষমতাকে প্রসারিত করার অধিকার তাঁদের আছে।... যে সব শব্দ অপরিহার্য নয় এবং আমরাও বুঝি না সে সব শব্দের বিশাল বোঝা যদি আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে প্রতিবাদ না করে উপায় নেই, কেননা তাতে ঘাড়ে ব্যথা হয়। (হক, ১৯৭৬ : ৪১)

আবদুল হক মনে করেন, অনাবশ্যক আরবি-ফারসি শব্দের প্রতি মোহ অযৌক্তিক। কোনো পূর্ব-পাকিস্তানি সাহিত্যিক (হিন্দু-মুসলমান) যদি কেবল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে উত্তম রূপে আত্মপ্রকাশ করেন তাহলে আপত্তি থাকবার কথা নয়। ইসলাম আমাদের সাহিত্যে গুরুত্ব পাবে। তবে সংস্কৃত শব্দবহুল হিন্দু সাহিত্যিকদের উত্তম সাহিত্যকেও আমরা সাহিত্য বলেই স্বীকার করব। কেননা সাহিত্যের আদর্শ হতে পারে কেবল সুন্দরের ধারণা, শুধু মানবপ্রেম, কিংবা মানবতাবাদী যে কোনো মতবাদ। সাহিত্যিক যে ধর্মেরই অনুসারী হন না কেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তার আরেকটি ধর্ম আছে, তা হলো 'সাহিত্য-ধর্ম'।

যারা বলেন পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় আমাদের সাহিত্য রচনা করা উচিত; এ প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষাই হওয়া উচিত আমাদের সাহিত্যের ভাষা এবং পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যের আমদানি বন্ধ করে দেওয়া উচিত — তাদের অযৌক্তিক প্রত্যাশার উত্তরে আবদুল হক অভিমত দেন —

> স্বাদেশিকতা এবং স্বাজাত্য খুব প্রশংসনীয় মনোভাব, কিন্তু জাতীয় বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে কোথাও একটা সীমারেখা টানতেই হবে। স্বাজাত্যের প্রেরণায় এবং বৈদেশিকতা বর্জনের জন্যই যদি উল্লেখিত দাবীগুলি জানানো হয়ে থাকে তবে আমাদের বর্জন করা উচিত ষ্টিমার, ট্রেন, এরোপ্লেন, বর্জন করা উচিত যাবতীয় বিদেশী সামরিক অস্ত্র, কেননা এ-সবই বিদেশী সভ্যতার অবদান। আমাদের থাকা উচিত কেবল নৌকা, গরুর গাড়ি এবং বাঁশের লাঠি, কেননা এগুলিই সত্যিকারের স্বদেশী বস্তু। ভারত, ইউরোপ, আমেরিকা সর্বত্র যাতায়াতও বন্ধ করে দেওয়া উচিত কেননা ওই সব ভূভাগে যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকায় আমাদের মধ্যে বিদেশী ভাবধারা অনুপ্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে। (হক, ১৯৭৬ : ৪৬)

আমরা জানি, নানা রকম মতাদর্শিক টানাপড়েনের ফলে তৎকালে আমাদের সাহিত্য অতীতমুখী রোমান্টিকতা, অবাস্তব আত্মপ্রসাদ, কল্পনাসর্বস্ব আত্মরঞ্জন এবং অস্পষ্ট চিন্তার কুয়াশায় অপরিচ্ছন্ন ছিল। এসব বিষয় বিবেচনায় সাহিত্যিকদের করণীয় সম্পর্কে আবদুল হক বলেন, তাঁদের ভালো ঐতিহ্যকে গ্রহণ এবং প্রগতির মিছিলে শরীক হতে হবে। অবশ্য এর জন্যে চাই — 'চিন্তার দুঃসাহস, কল্পনার ঔদ্ধত্য, বিদ্রোহের অধিকার।' এছাড়াও রাষ্ট্রকে আমাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ছাঁচে ঢালার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অনুভবে ও প্রকাশে বৈচিত্র্য আনতে হবে। নবলব্ধ স্বাধীনতার উদ্দীপনায়, নতুন জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় এবং নতুন সাহিত্য গড়বার উৎসাহে কাজ করে যেতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সাতচল্লিশ-উত্তর পূর্ব-পাকিস্তানে সাহিত্যাদর্শের সংকটের কারণে এ অঞ্চলের লেখক-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাংস্কৃতিকভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। রাজনীতি ও ধর্ম এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখে। বাংলা সাহিত্যের ব্যাপকতর পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করার প্রত্যয় নিয়ে স্বাতন্ত্র্যবাদী সাহিত্যিকদের যাত্রা শুরু হলে আবদুল হক তাঁদের বিপক্ষে অবস্থান নেন। স্বাতন্ত্র্যবাদীদের চিন্তার অপ্রসারতা তুলে ধরে তিনি বলেন, তাঁরা জানতে পারেন নি — স্বাধীনতা রেনেসাঁ নয়, রেনেসাঁর অন্যতম লক্ষণ। রেনেসাঁর কাজ বিচিত্র চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করা, রুদ্ধ করা নয়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে সে সম্ভাবনা চোখে পড়ে না। আবার আমাদের সমাজও যথেষ্ট পরিমাণ সাহিত্য-সচেতন নয়। কারণ হিসেবে তিনি সমাজের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ 'সমাজের সাংস্কৃতিক মানসের অপ্রসার এবং প্রতিকূল আর্থিক পরিস্থিতি'কে দোষারোপ করেছেন। 'সাহিত্যিক মূল্যবোধ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন — 'এগুলো ছাড়াও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্যের নিজস্ব পরিমণ্ডলে, বলা যেতে পারে সাহিত্য-চিন্তায় এমন কতকগুলো প্রবণতার অস্তিত্ব রয়েছে যা তার স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্যে কল্যাণকর হয়নি।' (হক, ১৯৬২ : ১৭)

তাঁর মতে, আমাদের সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের একাংশে মূল্যবোধের অভাব হেতু অপরিকল্পিত রেজিমেন্টেশনের প্রয়াস দেখা যায়। যার মূলে ছিল একটি ঐতিহাসিক আবহ। আমরা জানি, যে-কোনো দেশের স্বাধীনতা লাভ একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার; যা দেশবাসীর মানসিক আবেগের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের সমাজেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর ভাষায় —

> পাক-ভারত উপমহাদেশের বহু অঞ্চলে মানবিক মূল্যবোধের অপঘাত-মৃত্যু আমাদের সমাজের মূল্যবোধগুলোর উপরে ছায়াপাত করেছে ...। মানবিক, নৈতিক, রাজনৈতিক সর্বপ্রকার মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক মূল্যবোধেও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এই অবক্ষয় প্রকাশ পেয়েছে শিল্পাদর্শের পরিবর্তে শিল্পচেতনাহীন আদর্শ ও রেজিমেন্টেশনের প্রতি পক্ষপাতের আকারে। (হক, ১৯৬২ : ১৭)

তিনি মনে করেন, প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা স্বতন্ত্র পথের পথিক। প্রতিভার ধর্ম অনুযায়ী তাঁদের সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু এজন্যে যে স্বাধীন পরিবেশ প্রয়োজন, পূর্ব-পাকিস্তানে তা অনুপস্থিত ছিল। বরং সেখানে লেখকের আদর্শ, ঐতিহ্য, শব্দ ব্যবহাররীতি

প্রভৃতি পূর্বে নির্ধারিত হয়। ফলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা নন্দনগত নয়, ধর্মীয় এবং রাজনীতিক। অথচ আমরা এও জানি, আরোপিত রীতি-আদর্শ সাহিত্যের স্বতঃস্ফূর্ততার অবসান ঘটায়, সাহিত্য কৃত্রিম হয়ে পড়ে।

চিন্তার স্বাধীনতাহীনতা এবং শুচিবায়ুগ্রস্ততা বাংলা সাহিত্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলোর অন্যতম। যা প্রধানত ধর্মাশ্রয়ী। ফলে সমাজের একটি অংশে যুক্তিবাদের দুর্বলতা ও চিন্তার জড়তা দৃঢ়মূল হয়। যে কারণে আমাদের সাহিত্যিকদের চিন্তা-ভাবনা, বিষয়বস্তু নির্বাচন, এমনকি শব্দরীতি ও উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিধর্মী-প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে ব্যস্ততা দেখা যায়। এজন্যে অযৌক্তিকভাবে প্রশ্ন ওঠে : মুসলিম লেখকদের যে-সব রচনায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনৈসলামিক প্রভাব সংক্রামিত হয়েছে সেগুলো পাকিস্তানে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। আবদুল হক এরূপ বিতর্ককে নিরর্থক হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পাশাপাশি মূল্যবোধের সংকট, লেখকদের আত্মসমালোচনার অভাব, যোগ্য সমালোচকের অপ্রতুলতা এবং অল্পে বাজিমাত করার প্রবণতা (সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া) বাংলা সাহিত্যে সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফল হিসেবে এ অঞ্চলে গুণসম্পন্ন সাহিত্য এবং সমালোচকের অভাব প্রকট হয়েছে। (হক, ২০০৫ : ৯০) সমালোচকরা সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়, উত্তম ও অনুত্তম সাহিত্যকে পৃথকীকরণ এবং উত্তম সাহিত্যের সমঝদারিতে পাঠককে দীক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। (হক, ১৯৬২ : ২০) প্রবন্ধিক এরূপ পরিস্থিতির ব্যাখ্যা হিসেবে দুটি কারণ চিহ্নিত করেছেন —

> এক. স্বাধীনতা-পূর্বকালের উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব-পাকিস্তান কিছু সংখ্যক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক পেলেও উল্লেখযোগ্য সমালোচক পায়নি। এবং
> দুই. সমালোচনা-চিন্তায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ। (হক, ১৯৬২ : ২০)

লেখক ও পাঠকদের মধ্যে মূল্যবোধের সংকট সমকালীন সাহিত্যের অগ্রগতিতে আরেকটি বাধা ছিল। যে কারণে সাহিত্য ও অসাহিত্যের মধ্যকার সীমারেখাটা চিহ্নিত করা যায় নি। একই সঙ্গে খ্যাতিমান লেখকদের অনুকরণ ও অনুকরণকৃত লেখার স্বীকৃতি দেওয়ার কালচার একটি বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়। যা আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হয়। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক লিখেছেন —

> আজ আমাদের সবচেয়ে বেশী যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই অবক্ষয় নিরোধ, আমাদের সাহিত্যচিন্তার সংস্কার, শিল্পচেতনার চর্চা এবং সুস্থ সাহিত্যিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। ...স্বাধীনতার মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্য চিন্তার যে সব প্রবণতা শিল্পচেতনা ও সাহিত্যিক মূল্যবোধকে অভিভূত করে রেখেছে, সেসব প্রবণতাকে আমরা কতখানি বর্জন করতে পারি, আমাদের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে কতখানি শিক্ষা নিতে পারি, এবং আমাদের সাহিত্য-চিন্তাকে কতখানি পরিচ্ছন্ন করতে পারি তার উপর আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। (হক, ১৯৬২ : ২৩)

সকল সভ্য জাতির নিজস্ব সাহিত্য আছে। শিল্পে-বাণিজ্যে এমন কি শিক্ষায় ও বিজ্ঞানে একটি জাতি যতই উন্নত হোক, সাহিত্যকে বাদ দিয়ে কখনো নিজেকে উন্নত এবং অগ্রসর

হিসেবে দাবি করতে পারে না। কারণ, কোনো জাতির স্বকীয়তা প্রকাশিত হয় তার সাহিত্যের মাধ্যমে। পূর্বেই বলা হয়েছে, পূর্ব-পাকিস্তানের লেখক-বুদ্ধিজীবীরা সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রসঙ্গে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের নির্দেশ দেন। যা সাহিত্যের স্বাভাবিক গতিকে থামিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আবদুল হক 'সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা' শীর্ষক অপর প্রবন্ধে মানসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টি না হবার কারণ এবং সংকট থেকে উত্তরণে যুক্তিপূর্ণ মতামত দেন। সংকটের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন —

> ১। আমাদের সমাজ সাহিত্য সম্পর্কে উদাসীন। সাহিত্য অবিমিশ্রভাবে লেখকের পরিশ্রম হওয়া সত্ত্বেও তা পাঠকের যথাযথ সমাদর পায় না। তাঁদের ধারণা 'পূর্ব-পাকিস্তানে পড়বার মতো এবং পয়সা খরচ করে কিনবার মতো বই লেখা হয়না।' (প্রাবন্ধিক অবশ্য বিষয়টিকে অযৌক্তিক হিসেবে মত দিয়েছেন।)
>
> ২। শক্তিমান লেখকের অভাব।
>
> ৩। উদ্যমী, সৎ, রুচিবান ও নিষ্ঠাবান প্রকাশক ও সম্পাদকের অভাব। কেবল প্রতিভাসম্পন্ন লেখক-সম্পাদক, প্রকাশক ও সমালোচক পাঠক সমাজকে গ্রথিত করতে পারেন। যতক্ষণ সেটি সম্ভব না হয় ততক্ষণ সাহিত্যের মান-উন্নয়নের জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। (হক, ১৩৬৪ : ৪২৬-৪২৮)

সংকট উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের অভিমত —

> ১। সাহিত্যের সমালোচনা যথাযথ হতে হবে। দলীয় এবং ব্যবসাগত সমালোচনা পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা তা পাঠক সমাজের রুচি বিভ্রান্ত ও মনকে সন্দিগ্ধ করে তোলে।
>
> ২। মাঝে-মধ্যে পুস্তক-প্রদর্শনী, সাহিত্য আসর ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে যোগ্য লেখককে সম্মানিত করে পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে।
>
> ৩। ভালো বই কিনতে পাঠককে উৎসাহিত করতে হবে। ফলে প্রকাশক নতুন বই প্রকাশ করতে দ্বিধা করবে না।
>
> ৪। সরকারও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। প্রকাশিত প্রতিটি বইয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রয় করে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে পাঠক সৃষ্টি ও প্রকাশকদের সাহায্য করতে পারে। এছাড়া সরকারীভাবে মানসম্পন্ন ও জনপ্রিয় সাহিত্যের পুরস্কার প্রদান করে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। (হক, ১৩৬৪ : ৪২৮)

প্রতিভার স্বীকৃতিহীনতা এবং লেখকদের অর্থ সংকট বাংলা সাহিত্যের বিকাশের পথে আরেকটি অন্তরায়। প্রসঙ্গটি বিচার-বিশ্লেষণে আবদুল হক 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক' শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করেন। তাঁর মতে, সাহিত্যিকরা তাঁদের প্রতিভার যথাযথ স্বীকৃতি বা সম্মান পান না বিধায় বাংলা সাহিত্য যথাযথ ধারায় বিকশিত হয় নি। অথচ তাঁরাই দেশের সংবাদ-সাময়িক পত্রিকাগুলোর প্রাণ। বলা বাহুল্য, বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। আমরা জানি, সাহিত্যের স্রষ্টা উন্নত রুচি ও মননের চর্চা করায় তার সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানে এটিরই সংকট সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠলে তিনি লেখেন —

> তাঁর (লেখকের) উপর নির্ভর করলেও, অন্যের উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয় বেশি; যেখানে প্রীতি নয়, শ্রদ্ধা নয়, অনুকম্পাই তাঁর প্রাপ্য। আজও এ সমাজে সাহিত্যিক বলতে বোঝায় লক্ষ্মীছাড়া, খামখেয়ালী, দারিদ্র্য-পীড়িত এক শ্রেণীর মানুষ, সময়ে-অসময়ে নির্জনে মসীচর্চা যার নেশা। তিনি গ্রন্থকীট, অসামাজিক এবং বৈষয়িক ব্যাপারে অপদার্থ। কর্মকুশল ও সামাজিক ব্যক্তিদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র, অতএব সমাজের ধর্তব্যের বাইরে। (হক, ১৯৬২ : ৯)

প্রাবন্ধিকের মতে, অনুকূল কোনো পরিবেশ অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্যিকরা পান নি। পরিবার বা সমাজ থেকেও অনুপ্রেরণা পান নি। বরং সাহিত্যচর্চায় শক্তভাবে আসক্ত হয়েছে জানলে গুরুতর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। আবার এতকিছুর পর লিখলেও প্রকাশ-প্রচারের ব্যাপারটি কালে-ভদ্রে হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এদেশে জীবদ্দশায় নয়, পরলোকগতদের (সাহিত্যিক) মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় এবং তাঁদের মূল্য নির্ধারণ করা হয় সাধারণত ওজনদরে, অর্থাৎ কে কতটি বই প্রকাশ করতে পেরেছেন তাই দেখে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

সাহিত্যে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার পরিধি সম্পর্কে আবদুল হক সতর্ক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমরা জানি, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রুচিবোধসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ। সমাজ রুচিবোধহীন শিক্ষিত কিংবা সংস্কৃতিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ হলে সে সমাজে লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হলেও আধুনিক সাহিত্যের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। রাষ্ট্র সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কোনো নীতি-আদর্শের প্রতি অনীহা প্রদর্শন বা আক্রমণ করা হয়। কেননা, সরকারের ধর্মীয়-রাজনীতিক দর্শন থাকে। এজন্যে রাষ্ট্রের দ্বারা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার অর্থই হলো — 'সাহিত্যের আংশিক অথবা পূর্ণ অসহায় অবস্থা।' বিচক্ষণ ও কৌশলী সরকার এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে থকেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দোসররা এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন। সাহিত্য বিকাশের অন্যতম শর্ত প্রকাশের স্বাধীনতা তারা কেড়ে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল হক বলেন —

> সরকার সাহিত্যের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিলে, অন্যান্য কর্মচারীর অথবা কর্মীর মতো লেখককেও বিশেষ বিশেষ আদর্শের নকীব বিবেচনা করলে, সাহিত্যের উপকার হওয়া কঠিন। ... কেননা স্বতঃস্ফূর্ত এবং লেখকের নিজস্ব প্রেরণা ও প্রজ্ঞা থেকে উৎসারিত না হলে সাহিত্য মহৎ হওয়া সম্ভব নয়। (হক, ১৯৭৪ : ১০-১১)

কেননা কোনো বিশেষ আদর্শে আস্থাবান সরকারের পক্ষে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা তার উদ্দেশ্য সাধন করলেও রাষ্ট্রের বা সাহিত্যের হিত সাধন করতে পারে না। সরকারি পত্র-পত্রিকা, পুঁথি-পুস্তক, প্রকাশনা সংস্থা, প্রচার মাধ্যম কোনো কাজেই আসে না। তবে সরকারের ভূমিকা যে থাকবে না তা নয়; তা হবে পরোক্ষ। প্রাবন্ধিকের অভিমত —

> কোনো সরকার সাহিত্যের প্রকৃতই হিতসাধন কামনা করলে তার সর্বোত্তম উপায় তাঁদের সমর্থক ও বিরোধী সকল প্রকার অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার। নৈরাজ্যকে স্বীকার করে নেবার কথা বলা হচ্ছে না, তবে ঐ স্বাধীনতা যে-পরিমাণে অস্বীকৃত হয় সাহিত্যের স্ফূরণ ঠিক সেই পরিমাণে বিঘ্নিত হয়। (হক, ১৯৭৪ : ১৩)

অবশ্য, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ যে হয়নি তা নয়। তবে তা মূল্যমানে নয় — গণনায়। তাঁর মতে, যেটুকু ভালো তা হয়েছে সরকারি প্রকাশ মাধ্যমের বাইরের পত্র-পত্রিকায়।

সাহিত্যিকের দায়িত্ব সমাজের প্রতি শিল্পী হিসেবে। সাহিত্য সমাজের জন্যে। সাহিত্য সৃষ্টি সামাজিক কাজ বিধায় তা সমাজকে প্রভাবিত করে। সাহিত্যিকের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ব্যতীত পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে উপর্যুক্ত কারো পক্ষেই মৌলিক সৃষ্টি সম্ভব নয়। অবশ্য স্বাধীনতার অপব্যবহার যে কখনো কখনো হয় না তা নয়। এ জন্যে শিল্পীকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। সৎ ও দেশপ্রেমিক হতে হবে। মত প্রচারে স্বাধীন হতে হবে। সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্পর্কে আবদুল হক বলেন —

> মহৎ উপলব্ধি ব্যতীত এবং প্রচ্ছন্ন হোক অথবা ব্যক্ত হোক মহৎ দর্শন ব্যতীত মহৎ সাহিত্য সম্ভব নয়।... মহৎ সাহিত্য মাত্রেরই একটা অভ্রান্ত লক্ষণ সার্বজনীনতা এবং সর্বকালীনতা, কিন্তু এই সার্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা সাহিত্যিক যে বিশেষ স্থানে ও সময়ে সংস্থিত তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় থেকেই উৎসারিত হওয়া সম্ভব। (হক, ১৯৭৪ : ১৮–১৯)

চার

এ পর্যায়ে সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে আবদুল হকের মতামত আলোচনা করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, সমালোচকদের রুচির দীনতা বাংলা সাহিত্যের দীনতার অন্যতম কারণ। তাঁরা মনে রাখেন না — সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। কেননা, সময় এর মূল্যায়নে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বিচারক। বিষয়টি সমালোচকরা স্মরণে রাখেন না বিধায় কোনো কোনো সাহিত্যিক তাঁর জীবদ্দশায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও সমালোচনার স্বীকার হন। পূর্ব-পাকিস্তানের পাঠক-সমালোচকদের রুচির দীনতা সম্পর্কে তিনি বলেন —

> পূর্ব পাকিস্তানী সমাজের সাহিত্য-রুচি অনেক বেশী অবিকশিত। আমাদের সমাজ যদি উন্নত সাহিত্যের প্রত্যাশা করে তবে তার সাহিত্যরুচিকে আরও বিকশিত ও উন্নত হতে হবে, যাতে সমাজে নন-কনফরমিস্ট সাহিত্যকে উদারতার সঙ্গে সহ্য করতে ও বুঝবার চেষ্টা করতে পারে। (হক, ১৯৬২ :১৩৫-১৩৬)

সুরুচি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি এবং বোধসম্পন্ন পাঠক তৈরিতে প্রধান ভূমিকা রাখে। সাহিত্য উপভোগের মতো শিক্ষা, রুচি এবং রসবোধ না থাকলে কোনো মতাদর্শ অনুসারী ব্যক্তির পক্ষে পাঠক হওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্য উপভোগের প্রাথমিক শর্ত হলো — 'সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে নিতে হবে।' (হক, ১৯৭৬ : ২৮) প্রয়োজনে সংস্কারমুক্ত, সংস্কৃতিবান, মূল্যবোধসম্পন্ন ও রসজ্ঞ পাঠককে বিদ্রোহী হতে হবে।

দেশভাগ এ অঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশকে যে হারে ত্বরান্বিত করে সে হারে রুচিসম্পন্ন পাঠক বৃদ্ধি করে না। একই সঙ্গে শিক্ষিত পাঠকের একাংশ বিদেশি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। দেশের ভালো সাহিত্যের সঙ্গে তাদের যোগ বিলম্বিত হয়। অথচ এদেরই হাতে সমাজে চিন্তার প্রসার ঘটানো ও রুচির নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নিহিত

ছিল। বাংলা সাহিত্য বিকাশের পথে বিষয়টিকে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে আবদুল হক আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ও সাহিত্য-সাহিত্যিকদের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের উপর জোর দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন —

> আধুনিক শিক্ষিত-সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যকার এই ব্যবধান বিলোপের উপর সমাজে সাহিত্যের স্বীকৃতি, অথবা তার ব্যাপকতা, বহুলাংশে নির্ভর করছে। এই ব্যবধান বিলুপ্ত হলে সাহিত্যের সামাজিক স্বীকৃতিই কেবল সহজ হয়ে উঠবে না, স্বকেন্দ্রিকতা থেকেও সাহিত্য মুক্তি পাবে এবং বিশ্বজগতের চেতনায় উত্তীর্ণ হবে। (হক, ১৯৭৪ : ২২-২৩)

সাহিত্যের মূল্য নিয়ত পরিবর্তনশীল। কাল পরম্পরায় নতুন নতুন সাহিত্যের যোগ এবং মূল্য নির্ণয়ের মানদণ্ড নির্ধারিত হওয়ায় এ পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সমগ্র পরিপ্রেক্ষিত কখনো ধীরে আবার কখনো দ্রুত পরিতর্তিত হয়। সাহিত্যের মূল্যায়ন এজন্যে তাই মরীচিকা না হলেও মরীচিকার প্রায় সমগোত্রীয় হয়ে দাঁড়ায়। (হক, ১৯৮৪ : ৪২)

সাহিত্যিক এবং সমালোচকের গতিপথ একই সরলরেখার নয়। সাহিত্যে ধর্ম-দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি অনুষঙ্গ থাকে। সমালোচকের প্রবণতাও সাহিত্যিকের মতো হতে পারে। সাহিত্যিক লেখেন কোনো তাড়না থেকে আর সমালোচক দেখেন তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ অবস্থানগত কারণে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা চোখে পড়ে। ফলে একই বিষয় নিয়ে সমালোচনা করা হলেও তাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সময়ের ব্যবধান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ পার্থক্য বড় হয়। আবার একই বিষয় সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে মূল্যায়নের বিভিন্নতার কারণে যে লেখকের মূল্য বাড়ে বা কমে, তা নয়। সমালোচকের গৃহীত পদ্ধতি যাই হোক না কেন, সৎ ও মহৎ সাহিত্য কাল-পরম্পরায় সমালোচনার মাধ্যমেই চিরস্থায়ী হয়।

সাহিত্যিক বা সমালোচক কখনো কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের কারণে স্বরূপে প্রকাশিত হতে পারেন না। রাষ্ট্র যখন সবজান্তা সেজে দেশের অন্য বিষয়াবলির মতো সাহিত্যের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় বা সাহিত্যিকদের দলে টানতে চায় তখনই বিপত্তি বাধে। কেননা সাহিত্যের যথার্থ বিকাশ কেবল স্বাধীন সাংস্কৃতিক পরিবেশেই সম্ভব। আবার অবরুদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে অনেক সুযোগ সন্ধানী, অযোগ্য ও সাহিত্যিক খ্যাতি-প্রত্যাশী ব্যক্তি অযাচিতভাবে সাহিত্যের অঙ্গনে হাজির হন। অল্পতে বাজিমাত করার চেষ্টা করেন। আবদুল হক বিষয়টি সম্পর্কে বলেন —

> সাহিত্যের পথ-নির্দেশ বা সমালোচনা কেবল তাঁদেরই অধিকারভুক্ত যাঁরা প্রকৃতই সাহিত্যিক বা সমালোচক। প্রামাণ্য সমালোচনা ও দর্শন কেবল তাঁদের কাছ থেকেই আসতে পারে এক্ষেত্রে যাঁরা অধিকারী। কিন্তু এটা স্বীকার করা সম্ভব নয় যে যেহেতু একজন কেউ রাজনীতি, অর্থনীতি বা দর্শনে কৃতী ব্যক্তি অতএব তিনি আবশ্যিকভাবে সাহিত্যরথীও বটেন। (হক, ১৯৭৬ : ৪৯)

'সাহিত্যিক তাঁর যুগের সৃষ্টি এবং যুগের স্রষ্টাও; সাহিত্য-ঐতিহ্যের সৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের স্রষ্টাও।' (হক, ১৯৬২ : ৫৬) কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি হয় সাহিত্যের মূল্যমান নির্ণয় কালে। অর্থাৎ সাহিত্যের মানদণ্ড কী হবে? জনপ্রিয় না মূল্যবোধযুক্ত — কোন প্রকারের সাহিত্য

টিকে থাকবে? সমালোচকের গুণ কী? — প্রভৃতি নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হলে। আমরা জানি, সমালোচকেরা সাধারণত আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন, দোষ-গুণ উদঘাটন করেন, মতবাদ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু সমালোচক যখন সাহিত্যকে মত-নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করেন তখন সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয়। সমালোচকের গুণ প্রসঙ্গে আবদুল হক বলেন —

> সাহিত্য উপভোগের ক্ষেত্রে এজন্য প্রয়োজন সমালোচকের, সংস্কার-মুক্ত স্বচ্ছ-দৃষ্টি সমালোচকের। তাঁর কর্তব্য সাহিত্যিকের কৃতি এবং অকৃতি, সৌন্দর্য ও স্খলন নির্দেশ করা। যে-কোন রচনা পড়তে যতোই ভালো বা মন্দ লাগুক তার সত্যিকার মূল্যবানতা বা মূল্যহীনতা এই ভালো-মন্দ লাগার উপর নির্ভর করে না। (হক, ১৯৬২ : ৫৭)

অন্যত্র তিনি বলেন —

> সমালোচনা সাহিত্যের প্রধান কাজ হচ্ছে সাহিত্যের মূল্যবিচার, সাহিত্যিক মূল্যবোধ ও নীতিগুলোর প্রতিষ্ঠা এবং পাঠকের চিন্তন ও সংবেদনশীলতার সংস্কার, সেই সঙ্গে লেখকেরও। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমালোচক সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করেন, উত্তম সাহিত্য থেকে অনুত্তম সাহিত্যকে পৃথক করেন এবং উত্তম সাহিত্যের সমঝদারিতে পাঠককে দীক্ষিত করেন। (হক, ১৯৬২ : ২০)

সাহিত্যে সার্বজনীনতা অবশ্যম্ভাবী। যে সাহিত্যে সার্বজনীনতা যত বেশি, সাময়িকতা ও লৌকিকতা যত কম, যে সাহিত্য যত বেশি মৌলিক, যত খাঁটি, সে-সাহিত্য তত বেশি অগ্রসর ও দীর্ঘায়ু। যে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগ যত বেশি তার মূল্য তত অধিক। সময় সাহিত্য বিচারের অন্যতম নিয়ামক। জনপ্রিয় হোক বা না হোক সু-সাহিত্য কাল পরম্পরায় টিকে থাকে এবং সংস্কৃতির অংশ হয়। কালের এই পরিমার্জনরীতি সাহিত্যের জন্যে শিক্ষাস্বরূপ। প্রাবন্ধিকের মতে, সাহিত্যের ধারা দুটি —

> এক. জনপ্রিয় সাহিত্য এবং
> দুই. সাহিত্য-ধর্মবোধযুক্ত সাহিত্য। যারা দ্বিতীয় ধারাটি অনুসরণ করেন তারাই টিকে থাকেন।

জনপ্রিয়তা সাহিত্যের মানদণ্ড নয়। অনাদৃত, ধুলোমলিন, কীটদষ্ট রচনাও সাহিত্যের বিচারে উত্তীর্ণ হতে পারে। (হক, ১৯৬২ : ৭৭) নিম্নমানের সাহিত্যকে উচ্চমানের সাহিত্য অথবা অসাহিত্যকে সাহিত্য ধরে সমালোচনা লিখলে লেখার মান উন্নত হয় না, বরং নিম্নগামী হয়। (হক, ১৯৯৩ : ৪১)

সাহিত্য সৃষ্টি ও সমালোচনায় সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক-অসাম্প্রদায়িক, সৎ-অসৎ এরূপ পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণা নিয়ে বিচার করা অনুচিত। সাহিত্যের স্রষ্টা, পাঠক ও সমালোচক হবেন নির্মোহ, নির্লোভ, রসবোধ সম্পন্ন ও মাত্রাজ্ঞানযুক্ত। অথচ পাকিস্তান-পর্বে সাহিত্যরসিকেরা অমীমাংসিত রাজনীতিক দর্শনের মতোই সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে বিভাজিত হয়ে পড়েন। তাঁরা বিস্মৃত হন, যে দেশে উত্তম সাহিত্য ভাণ্ডার যত বেশি সে দেশের সমালোচনা সাহিত্য তত বেশি উন্নত।

জীবন ও সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব সর্বাধিক। লেখকের উপর সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকায় তাঁর পক্ষে কোনো পূর্ব-নির্ধারিত বিধি-বিধান মেনে চলা সম্ভব নয়। কেননা সাহিত্যিক রুচি তাড়িত এবং কল্যাণকামী। আবদুল হকের অভিমত —

> সমাজের আরো অনেক উপাদানের মত সাহিত্যও পরিবেশ সৃষ্টি করে। ভালো সাহিত্য সুরুচি ও সংস্কৃতি বিকীরণ করে; আবার অসুস্থ সাহিত্য বিপরীত ফল উৎপাদন করে। সুরুচি ও সংস্কৃতিকে, সুন্দর জীবনের ধারণাকে নিমজ্জিত করার অনেক উপাদানই সমাজে আছে; সাহিত্যও তেমনি একটি উপাদানে পরিণত হলে সমাজের কিছু আসে-যায় না একথা স্বীকার করা কঠিন। (হক, ১৯৭৪ : ৬)

পাঁচ

বাংলাদেশ যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত বিভাগ-পূর্বকালে সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী একটি সময় পর্যন্ত যাত্রা বা নাটকের চর্চাকে সুনজরে দেখে নি। 'যাত্রা-নাটক-গান-সঙ্গীত' এবং অন্যান্য শিল্পকলার চর্চা মুসলমান সমাজে একরকম প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। ফলে বাংলা নাটকের কোনো সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তৈরি হয় নি। আর পাকিস্তান-পর্বে নাটক মঞ্চায়নের উপর ছিল সরকারি বিধি-নিষেধ। ফলে পাকিস্তানপর্বে এদেশের মঞ্চ ব্যবস্থায় সেসব নাটকই অভিনীত হয় যেগুলো অলিখিতভাবে অনুমোদিত। যা সাহিত্যের জন্যে সুখকর নয়। তাই নাটকের বিকাশের স্বার্থে অনুমোদনহীন নাটকের প্রয়োজন পড়ে এবং প্রয়োজন হয় আলাদা মঞ্চ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হলে তার মাধ্যমে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সমৃদ্ধি হতে পারে। তবে নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। আবদুল হক মনে করেন, কেবল এ অঞ্চলের মানুষের রুচির বিকাশ সমস্যাটির সমাধান করতে পারে। কেননা 'অতীতে যা হয়নি ভবিষ্যতে তা হবে না, কোনো সাহিত্যের ইতিহাস থেকেই তা বলা যায় না।' (হক, ১৯৮৪ : ২১)

সাহিত্য-আঙ্গিক হিসেবে নাটকের মর্যাদা, বাংলা নাটকের সাম্প্রতিক সংকট এবং নাটকের মান-উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে আবদুল হক 'নাটক ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। নাটক সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সার্থক নাটকের কিছু মানদণ্ড রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান-পর্বে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলায় নাটকের মান বিচারে মানদণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় নি। নাট্যকারগণ কেবল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মঞ্চসফল নাটক রচনাতে ব্যস্ত থেকেছেন। সেজন্যে নাটককে আর সাহিত্যের আঙ্গিক হিসেবে বিচার করা সম্ভব কিনা প্রশ্ন ওঠে। আবদুল হক বলেন —

> আধুনিক বাংলা নাটকে সাহিত্যগুণ এবং মঞ্চ সাফল্যের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে। যা মঞ্চসফল তার সাহিত্যমূল্য প্রায়শঃই নেই, এবং যার সাহিত্যমূল্য আছে তার মঞ্চসাফল্য অনিশ্চিত। একই সঙ্গে মঞ্চসফল অথচ সাহিত্য হিসাবে উত্তম এমন নাটক একালে বেশী লেখা হয়নি, ব্যতিক্রম হিসাবে এবং বিরলভাবেই লেখা হয়েছে। (হক, ১৯৬২: ৪১)

অথচ উনিশ শতকে বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে এমনটি দেখা যায় নি। সেখানে মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকারগণ বাংলা সাহিত্যে

অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু এঁদের পরের নাটকে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের নাটকে সাহিত্যকে প্রাধান্য না দিয়ে জনপ্রিয়তাকে মূল্যায়ন করা হয়। বাংলাদেশের নাট্য-সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কারণ —

> নাটক সম্বন্ধে এই অবচেতন বা সচেতন ধারণা যে নাটক শুধুই নাট্যমঞ্চের জন্য, নাটক দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে কিনা সেটাই শুধু বিচার্য, যদি পারে তবে চাইবার আর কিছু নেই। ব্যবসায়ী নাট্যমঞ্চের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই দৃষ্টিভংগীর মধ্যে হয়তো দোষের কিছু নেই, কিন্তু সাহিত্যের বৃদ্ধির পক্ষে এ দৃষ্টিভংগী হয়েছে মারাত্মক।... এবং এই কারণেই প্রধানতঃ নাট্যোৎসাহী চক্রে এবং প্রাকৃত দর্শক মহলে নাটক পঠিত হলেও তার বাইরে নিছক সাহিত্য হিসাবে নাটক সামান্যই পঠিত হয়। (হক, ১৯৬২ : ৪২)

নাটক কেবল নাট্যমঞ্চের জন্যে — এ ধারণা ভুল। কারণ বহু নাটক আমরা মঞ্চে উপস্থাপন না করেও পাঠের মাধ্যমে রস আহরণ করি। গ্রিক নাট্যকারগণ, শেক্সপিয়র, ইবসেন, বার্নার্ড শ' পড়ে মুগ্ধ হই। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা নাটক একবার দেখবার পর দর্শক আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কারণ এসব নাটকে জীবনবোধ অনুপস্থিত। পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্যসাহিত্যে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে নাট্যকারদের কাছে আবদুল হকের আশা ও আহ্বান —

> নূতন স্বপ্ন তাঁদের মনে জাগবে, এবং জাগাবে নূতন উচ্চাকাংখা। পণ্য বিক্রয়ের দুঃসহ প্রতিযোগিতা থেকে নাটককে উদ্ধার করে তাঁরা সৎ-সাহিত্যের সম্মানজনক আসনে স্থাপন করবেন– এই তাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। ভবিষ্যৎ সেই নাট্যকারদের জন্যই যাঁরা ক্ষণিক হাততালির মোহে মুগ্ধ নন, যাঁরা চিন্তায় সৎ, জীবনবোধে আন্তরিক এবং নাট্যধর্মে নিষ্ঠাবান। জনপ্রিয়তা হয়তো তাদের জন্য নয়, কিন্তু শিল্পোৎকর্ষের যে পরম পুরস্কার তা একদিন তারা পাবেনই। (হক, ১৯৬২ : ৪৩)

নাটক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অনুন্নত শাখা। এ শাখার সমৃদ্ধি সাধনে অনুবাদ নাটক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা অনুবাদ নাটক — অনুবাদ হলেও তা নাটক। সেখানে চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনার বিন্যাস এবং জীবনসত্যের উপস্থিতি লক্ষযোগ্য। আবদুল হক এই শাখার সমৃদ্ধি সাধনে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বিদেশের উন্নত নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনুবাদ করেছেন ইবসেন, বার্নার্ড 'শ প্রমুখের রচনা। দৃষ্টি দিয়েছেন মঞ্চায়নের উপর। প্রাবন্ধিকের অভিমত —

> বাংলা নাট্য-সাহিত্য এবং দর্শকদের রুচিকে উন্নত করতে হলে বিদেশের নাটক আর তার টেকনিকের সংগে পরিচিত হওয়া এবং সে সব টেকনিক আত্মস্থ করা একান্তই প্রয়োজন। অনুবাদ নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সেটা সবচেয়ে ভালোভাবে হতে পারে। (হক, ১৯৬২ : ৫৪)

কবিতা সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা। কাল-পরম্পরায় তা আবার নানা শাখা-প্রশাখায় অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান-পর্বে বাংলা কবিতা কিছুকাল তার স্থান ও জনপ্রিয়তা হারিয়ে কেবল গীতি-কবিতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আবদুল হক বাংলা কবিতার এরূপ দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর ভাষায়,

'দুর্বোধ্যতার বিলাস কবিতার পক্ষে প্রায় আত্মহত্যার শামিল।' (হক, ১৯৬২ : ৬৭) তবে 'দুর্বোধ্যতা' কবিতার জনপ্রিয়তা কমে যাবার একমাত্র কারণ নয় — অন্যতম কারণ। এর সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার উত্থান, মুনাফাপ্রীতি, জীবনের নৈঃসঙ্গ্য চেতনা প্রভৃতিও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

দুরূহতা, চিন্তায় ও প্রকরণে অস্পষ্টতা, চতুরতা, গাদ্যিক ঢঙ এবং অন্যান্য লক্ষণের অতিরিক্ত চর্চা কবিতার জন্যে ক্ষতিকর। পশ্চিমবঙ্গের এবং পশ্চিমাদের কবিতায় তা আজ প্রমাণিত। বাংলাদেশেও কারো কারো মধ্যে এ চর্চা চলছে। তারা ভুলে যান, অস্পষ্টতার চর্চা অধিক হলে বক্তব্য হারিয়ে যায়। ভুলে যান, বক্তব্য ছাড়া কবিতা কাঠামো মাত্র। এরপরও বাংলা কবিতার অগ্রগতিতে আশান্বিত হয়ে আবদুল হক লিখেছেন —

> যা কবিতা তা কবিতা হিসেবেই স্বীকার্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, একথা বলা চলে... চল্লিশের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের তুলনায় বাংলাদেশীয় কবিদের সৃষ্টিশীলতা অধিকতর সক্রিয়; তাঁদের কবিতা অধিকতর সুগঠিত ও দৃঢ়পেশী। (হক, ১৯৭৬ : ২৫-২৬)

অনুবাদ একটা বাঞ্ছনীয় সাহিত্যকর্ম, কেননা অনুবাদও সাহিত্যের একটা শাখা। 'উত্তম অনুবাদ-সাহিত্য পাঠক-সমাজের রুচির সম্প্রসারণে ও মৌলিক সাহিত্যের রূপ-বৈচিত্র সাধনে সহায়তা করে।' (হক, ১৯৭৬ : ১৬৬) কিন্তু এদেশে যে-সব অনুবাদ দেখা যায় তার বেশির ভাগই হয়েছে বৈদেশিক ও বিজাতীয় রাজনীতিক স্বার্থের আনুকূল্যে। এবং এই কর্মে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরাও অংশ নিয়েছেন। এই কাজে যে-পরিমাণে তাঁরা তাঁদের উদ্যম ও সময় নিয়োজিত করেছেন, সেই পরিমাণে আমাদের মৌলিক সাহিত্যের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আবদুল হক বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইবসেন ও রবার্ট শেরউডের নাটক অনুবাদের পাশাপাশি তাঁদের রচনাকর্মের মূল্যায়নে 'পুতুলের সংসার', 'প্রেতাত্মা', 'রসমার্স হোম', 'হেড্ডা গাবলার' 'মহাস্থপতি', 'জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান'সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি। প্রবন্ধগুলো *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

সমকালীন অবরুদ্ধ আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্তি দেবার প্রয়াসে আবদুল হক লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনা তৎকালীন নানা প্রগতিশীল সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। ফলস্বরূপ আমরা সামগ্রিকভাবে জাগরণের দিকে অগ্রসর হই। তাঁর মতে, ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশে তার কাঙ্ক্ষিত রূপে প্রকাশিত হবে। তিনি সাহিত্য সৃষ্টি, সমালোচনা ও পাঠক তৈরিতে কোনো পূর্বশর্তকে অপ্রয়োজনীয় হিসেবে প্রমাণ করেন। লেখকের সার্বিক স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেন। সাহিত্যের প্রসারে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যমূলক সহযোগিতার নীতিকে অসার হিসেবে চিহ্নিত করেন। এবং পৃষ্ঠপোষকের উপর গুরুত্ব দেন। দেশভাগের ফলে ঔপনিবেশিক অবস্থার অবসানের পরও বাংলা সাহিত্যের আশানুরূপ উন্নতি না হবার কারণসমূহ চিহ্নিত করেন। ফলে আমাদের সাহিত্যে ধীরে ধীরে স্বাতন্ত্র্যবাদীদের পদচারণা কমে আসে। বাঙালির ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় রূপান্তরিত হয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ

করে। বাঙালি জাতি সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়। অর্থাৎ বলা চলে, বাংলা সাহিত্যের বর্তমান সমৃদ্ধ জগৎ তৈরিতে আবদুল হক অনবদ্য অবদান রেখেছেন।

টীকা

১. আবদুল হকের ছদ্মনাম ছিল আবু আহসান, আবুল আহসান, আবু রায়হান, মিসেস এম. এ হক এবং ইবনুল আরাবী।

২. আবদুল হকের জাতীয়তাবাদভিত্তিক প্রবন্ধসমূহ পরবর্তীকালে *বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৩৮০) শিরোনামে গ্রন্থভুক্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান (১৯৯১)। *স্বরূপের সন্ধানে*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
আবদুল হক (১৯৬২)। *ক্রান্তিকাল*, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা।
আবদুল হক (১৯৭৪)। *সাহিত্য ও স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আবদুল হক (১৯৭৬)। *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ*, মুক্তধারা, ঢাকা।
আবদুল হক (১৯৮৪)। *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আবদুল হক (১৯৯৩)। *চেতনার এলবাম এবং বিবিধ প্রসংগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আবদুল হক (২০০৩)। *স্মৃতি-সঞ্চয় ১*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), সময় প্রকাশন, ঢাকা।
আবদুল হক (২০০৫)। *স্মৃতি-সঞ্চয় ২*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৯৮৫)। *অতীত দিনের স্মৃতি*, খোশরোজ পাবলিকেশনস লিঃ, ঢাকা।
আহমাদ মাযহার (২০০১)। *আবদুল হক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মাহবুব বোরহান (২০০৮)। *আবদুল হক : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (২০০৫)। *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মোরশেদ শফিউল হাসান (২০০৭)। *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া ১৯৪৭-১৯৭০*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।
সাঈদ-উর-রহমান (১৯৮৩ক)। *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।
সাঈদ-উর-রহমান (১৯৮৩খ)। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৯)। *সাহিত্যের শব্দার্থকোষ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
হাবিব রহমান (২০০৩)। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
হাবিব রহমান (২০০৯)। *বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন*, মিত্রম, কলকাতা।

প্রবন্ধপঞ্জি

আবদুল হক (১৩৬৪)। *সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা*। *সমকাল*, বর্ষ ১, সংখ্যা ৭-৮, (সিকান্দার আবু জাফর সম্পা.), ঢাকা।
আবুল ফজল (১৩৬৮)। *আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য*। *সমকাল*, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৬-৮, (সিকান্দার আবু জাফর সম্পা.), ঢাকা।